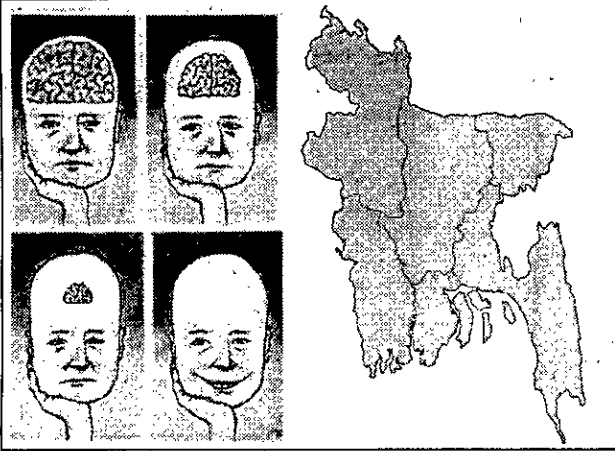




মেধার মূল্যায়ন- জাতি গঠনের অপরিহার্য নিয়ামক

ছেলেবেলায় শোনা ছোট একটি গল্প দিয়ে শুরু করছি। কোন একটি অফিসে আব্দুল নামের একজন পিয়ন চাকরি করত। একদিন বড় সাহেবকে আব্দুল বলল, 'স্যার যদি অভয় দেন তাহলে একটি কথা জিজ্ঞেস করি।' বড় সাহেব মুচকি হেসে বললেন, 'বল'। আব্দুল বড় সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার সুপারভাইজার কবির সাহেব আমার চেয়ে বেশি বেতন পান কেন?' প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বড় সাহেব বললেন, 'আব্দুল একটা কাজ কর- দুদিন আগে আমার পোষা বিড়ালটি বাচ্চা দিয়েছে। কয়টি বাচ্চা দিয়েছে দেখে এসো।' আব্দুল বড় সাহেবের বাড়ি গেল এবং এসে বলল, 'স্যার পাঁচটি বাচ্চা দিয়েছে।' বড় সাহেব

ড. মোঃ নাছিম আখতার

আবার জিজ্ঞেস করলেন 'বাচ্চাগুলোর মধ্যে কয়টি মেনি এবং কয়টি হলো?' আব্দুল বলল, 'তাতো দেখি নাই স্যার।' সে আবার গিয়ে মেনি ও হলোর সংখ্যা জেনে আসল। বড় সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কি রঙের বাচ্চা আছে?' আব্দুল বলল, 'এটা তো দেখা হয় নাই স্যার। আবার দেখে আসতে হবে।' এবার সুপারভাইজার কবির সাহেবকে ডেকে বড় সাহেব বললেন, 'কবির আমার বাসার বিড়াল বাচ্চা দিয়েছে- কয়টি বাচ্চা দিয়েছে জেনে আসেন।' কবির সাহেব ফিরে এসে বললেন, 'স্যার মোট পাঁচটি বাচ্চা দিয়েছে। এর মধ্যে ৩টি মেনি এবং ২টি হলো। ২টির রং ধূসর এবং ১টি কালো আর ২টি সাদা। অফিসের বড় সাহেব তখন আব্দুলকে ডেকে বললেন, 'এবার বুঝেছো তো কেন কবির সাহেব তোমার চেয়ে বেশি বেতন পান! প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করার জন্য গল্পটির অবতারণা করলাম।

এমপিওভুক্ত কলেজ বা স্কুলে চাকরির জন্য ডোনেশনের নামে যে টাকা লেনদেন হতো তার কলেবর ছিল যেমন বৃহৎ, তেমনি ক্ষুদ্র নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মেধা। অর্থাৎ টাকার সঙ্গে মেধার সম্পর্ক ছিল ব্যস্তানুপাতিক। এতে হয়ত পরিচালনা পর্যদ বা বিশেষ কোন গোষ্ঠী লাভবান হয়েছে। কিন্তু দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছে শতছিন্ন ও হতদরিদ্র। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের সাহসী ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ সুশিক্ষিত

জাতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো, এমপিওভুক্ত স্কুল এবং কলেজে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ প্রদান পদ্ধতি চালুকরণ। কিন্তু কালেরকণ্ঠের ২৭/১২/২০১৬ তারিখের 'সংসদ ভবনে কলেজের নিয়োগ পরীক্ষা' শিরোনামে লেখা খবর আবার আমাদের বিচলিত করে। খবরে প্রকাশ, নিয়োগে ৮ লাখ থেকে ১৫ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে এবং নিয়োগ নির্ব্বিয় করতে ডামি প্রার্থীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টি যদি সত্য হয় অর্থাৎ শব্দের মধ্যে যদি ভুল থাকে, তাহলে এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের পাঠদানের উৎকর্ষ সাধনে সরকারের অপরিহার্য উদ্যোগ ভেঙে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশ গড়ার প্রত্যয়ে মেধাকে প্রধান্য দিতেই হবে। পৃথিবীর পরিবর্তনের মূল শক্তি হলো মেধা, নিষ্ঠা এবং সততা। এই তিনটি গুণ হলো কোন জাতি বা

দেশ গঠনের মূল উপাদান। এগুলোকে অগ্রাহ্য করে হয়ত সাময়িক সাফল্য আসতে পারে; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির জন্য প্রয়োজন মেধার সঠিক মূল্যায়ন। বিষয়টি উপলব্ধি করেই পশ্চিমা বিশ্ব টাকার বিনিময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে মেধা আমদানি করেছে। টাকা রোজগারের অনেক রাস্তা আছে কিন্তু দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে টাকা উপার্জন কতটা যুক্তিযুক্ত, তা সচেতন মহলের ভাববার বিষয় হতেই পারে। ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের দৈনিক ডেইলি সান পত্রিকায় খবরের শিরোনাম ছিল 'SSC certificates on sale!'. খবরে প্রকাশ, একটি জালিয়াত চক্র টাকার বিনিময়ে সুযোগ সন্ধানী ভূয়া ছাত্রদের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। শিক্ষায় যখন এ ধরনের অসাধুতা বিরাজ করছে, তখন ভাবতে হবে এই শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, নাকি জাতির জন্য গুরুদণ্ড!

আমার সন্তান ২০১৪ সালে পিএসসি ফাইনাল পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার আগের দিন রাতে মায়েরদেব ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ ব্যস্ত থাকতে দেখেছি এবং ওই প্রশ্নগুলো রাত জেগে কোমলমতি ছাত্রদের যেভাবে মুগ্ধ করতে দেখেছি, তাতে কোমলমতি ছাত্রদের নৈতিক বিকাশের বিষয়ে শঙ্কা থেকেই যায়। শুধু তাই নয়, এতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাদের মধ্যে বিরাজ করে এক ধরনের হতাশা। এই হতাশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠী নিয়ে দেশ খুব বেশিদূর এগোতে পারবে না বলে মনে করি। নিজের সন্তানের পরীক্ষার সময় পরীক্ষা পদ্ধতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্ববোধ থেকেই ৬ জানুয়ারি ২০১৬ দৈনিক কালেরকণ্ঠে 'প্রশ্নপত্র সুরক্ষায় একান্ত ভাবনা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখি।

গত ২৬/১২/২০১৬ তারিখের একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। আমার বড় বোন ছিলেন জেলা সমবায় অফিসার। তিনি বর্তমানে অবসরে আছেন। আমার নানি নামকরা হেমিও ডাক্তার ছিলেন। বড় বোন ছেলেবেলায় নানির সান্নিধ্যে বড় হয়েছেন। তাই তারও ইচ্ছা হেমিওপ্যাথিতে ডাক্তারি পড়ে মানুষের সেবা করবেন। প্রথম বর্ষ পরীক্ষা দিতে গিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন- তার ভাষাতেই বিষয়টি

উপস্থাপন করলাম- 'পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি আমি ব্যতীত সবাই বই খুলে লিখছে। ম্যাজিস্ট্রেট যখন আসছেন তখন পর্যবেক্ষকগণই ছাত্রদের সাবধান করে দিচ্ছেন। ছাত্ররা তাদের বই লুকিয়ে ফেলছে। আবার ম্যাজিস্ট্রেট চলে গেলে পুনরায় বই খুলে লেখা শুরু করছে। পরীক্ষার পর অপেক্ষাকৃত তরুণ একজন শিক্ষার্থী আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, খালিম্যা আপনাকে কদমবুড়ি করা উচিত। এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন না।' এখান থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, একজন অনৈতিক মানুষও বোঝে কোনটি সঠিক আর কোনটি অন্যায়! ব্যক্তি মালিকানার অনেক প্রতিষ্ঠানেই পরীক্ষার হলে সুবিধা না দিলে পর্যবেক্ষকগণকে মালিক অথবা ছাত্রদের পক্ষ হতে নানা ধরনের কটু কথা শুনতে হয়, এমনকি কখনও কখনও চাকরি বাচানো কঠিন হয়ে পড়ে।

শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কেন্দ্র সচিবের প্রতি জরুরী নির্দেশনা আমাদের দৃষ্টি কাড়ে। পরীক্ষা কেন্দ্রের নির্দেশনায় বলা হয়েছে- 'মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহন বা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র কেন্দ্র সচিব ক্যামেরাবিহীন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন।' এরই প্রতিফলন ঘটেছে ৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক জনকণ্ঠে 'মোবাইল নিয়ে হলে প্রবেশ, ভালুকায়া ৬ শিক্ষককে অব্যাহতি' শিরোনামে খবরটিতে।

উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই। মেধাবী মানুষ পল্লু হলেও তার মেধাশক্তির সুফলটুকু তারা গ্রহণ করছে পূর্ণমাত্রায়। স্টিফেন হকিংস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত যশা অধ্যাপক। বর্তমানে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তিনি হাঁটা-চলা ও কথা বলতে পারেন না। কিন্তু ইংরেজ জাতি তার চিন্তা-ভাবনা কম্পিউটারের মাধ্যমে পড়ে নিজেদের জ্ঞানভান্ডারকে করছে সমৃদ্ধ। আর আমরা ইটিজি ঠিক উল্টো পথে। টাকার বিনিময়ে জ্ঞানী বা মেধাবী প্রার্থীকে সুযোগ না দিয়ে সুযোগ করে দিচ্ছি একজন স্বল্প মেধার প্রার্থীকে। ফলে সার্বিকভাবে কমছে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা। আর প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে যেহেতু দেশ, তাই সঙ্গে সঙ্গে দেশও হারাচ্ছে সৃজনশীল কর্ম সম্পাদনের সক্ষমতা।

১ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রীর 'সমালোচনা না করে শিক্ষার মানোন্নয়নে এগিয়ে আসুন' নির্দেশনাটি স্মরণ করেই শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রস্তাবনাটি তুলে ধরলাম। সর্বস্তরে শিক্ষার উদ্যোগ বর্তমান সরকারের মহৎ ও যুগোপযোগী একটি পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপকে সঠিক, সুন্দর ও ফলপ্রসূরূপে পরিচালনার জন্যে সরকারের আরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। ডিজিটাল বাংলাদেশের মাহেন্দ্রক্ষণে যে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রকে ডিজিটাল মনিটরিং-এর আওতায় এনে শিক্ষার মান প্রায় ১০০% পর্যন্ত উন্নীত করা সম্ভব। অর্থাৎ পরীক্ষার হলগুলো যদি কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং মাল্টিমিটিরিং ডেস্কটপের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তবে পরীক্ষায় যে কোন ধরনের 'অসদুপায় অবলম্বন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। দেশ পাবে তার কাল্পনিক মানের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, যাদের মেধা ও প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত হবে দেশের প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। মেধার মূল্যায়নে স্বচ্ছ শিক্ষাব্যবস্থাই হোক দ্বিধাজনী জাতি গঠনের অন্যতম নিয়ামক- এই প্রত্যাশায় চেয়ে রইলাম আগামী পানে।

লেখক : ডিন, ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর